দৈনিক খবর
04 DEC 1991

সন্ত্রাসের শে

আবুল কা

১৯৯১ সালে গণভোটের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর থেকে যে সমস্যা জাতির জীবনকে অচল করে রেখেছে তা হল সন্ত্রাস।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা এখন Army-র হাতে নেই। সরকার এখন জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। জাতীয় সংসদ এখন জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি ও রক্ষাকর্তা। পুলিশ, বিডিআর, মিলিটারি এখন রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। তথাপি, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সমাজের স্তরে স্তরে ক্ষমতা এখন Army-র হাতে না থাকলেও Armed লোকদের হাতেই আছে।

ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও ইত্যাদি নানাবিধ আন্দোলনও আরম্ভ হয়েছে। গণমনে হতাশা তীব্র হয়ে চলছে। গণভোটের দ্বারা গঠিত সরকার জনসাধারণের মনে এখনও কোনো আশার সঞ্চার করতে পারেননি। তবে এ অবস্থায়ও একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, তা হল, বিরোধী দলসমূহ সরকার উৎখাতের জন্য উঠেপড়ে লাগেনি। জাতীয় সংসদের ভিতর যে ৩৩০ জন সদস্য আছেন, দল-মত নির্বিশেষে তাঁরা সকলেই সরকারকে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী। সরকারের অস্তিত্বের সঙ্গে তাঁদের অস্তিত্ব এখন একাকার। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা সরকারী দল আর বিরোধী দলসমূহ একত্রে মিলে মিশে ভোগ করছে। ইংরেজ শাসনের অবসানের পর গত ৪৪ বছরের মধ্যে এটা সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। তবে, কি সরকারি দল, কি বিরোধী দল- কোনো পক্ষই জনগণের উদ্দেশে এমন কোনো বক্তব্য প্রচার করছেন না যাতে গণমনে কোনো আশার সঞ্চার হতে পারে। মানুষের হতাশা গভীরতর হচ্ছে।

গত অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে আমাদের সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রসত্তা যে ধারায় বিকশিত হয়ে আসছে, তারই একটি পর্যায় হল বর্তমান অবস্থা। এ অবস্থা আকস্মিকভাবে দেখা দেয়নি। সন্ত্রাসের প্রকোপ বিরাটভাবে বেড়েছে- এই যা নতুন। দেশের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন সন্ত্রাসের এক একটি কেন্দ্রবিন্দু। যে কোনো সন্ত্রাসীকে পুলিশ গ্রেফতার করলেই তার মুক্তির দাবিতে এখন মিছিল বের হয়, পোষ্টার দেখা যায়। এভাবে কতদিন চলবে? এ অবস্থার অবসান কবে হবে? আর কিভাবেই বা এর অবসান ঘটবে? এরপর কিরকম অবস্থা আসবে?

এসব প্রশ্ন নিয়ে কোথাও যে খুব গভীর চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, তা মনে হয় না। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাস নিয়ে হৈ-চৈ আছে। হৈ-চৈ-এর ভিতর দিয়ে যেসব বক্তব্য বেরিয়ে আসছে সেগুলোর দিকে একবার মনোযোগ দেয়া যাক।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে। যারা গণতন্ত্র বানচাল করতে চায় তারাই সন্ত্রাস ঘটাচ্ছে। ষড়যন্ত্রটা কি এবং কারা গণতন্ত্র বানচাল করতে চায়- সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে তিনি কিছুই বলেন না। তবে অনেকেই মনে করেন যে, তিনি শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকেন। তিনি আরও বলে থাকেন যে, সন্ত্রাস কঠোর হস্তে দমন করা হবে। কিন্তু আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাকে সক্রিয় করে সন্ত্রাস দমনের কোনো বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা হল, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে সবচেয়ে বেশি হৈ-চৈ, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার লোকেরা নীরব সাক্ষীর ভূমিকাই পালন করে চলছেন। এমনকি যেখানে অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, সেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ সাক্ষীগোপালের ভূমিকা পালন করছে মাত্র। প্রধানমন্ত্রীর 'কঠোর হস্তে দমন' তো দূরের কথা, কোমল হস্তে দমনের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সকলেই হতাশ। এই হতাশার পরিণতি কি হবে? এক, দুই, তিন বছর পরে? পাঁচ, দশ, পঁচিশ বছর পরে? একশ' দুইশ' পাঁচশ' বছর পরে? রাষ্ট্র ভাঙ্গে, রাষ্ট্র গড়ে। আমাদের জীবনকালে বৃটিশ-ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান হয়েছে, তারপর পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ হয়েছে, উপমহাদেশে রাষ্ট্রীয় ভাঙ্গাগড়া আরও হতে পারে। প্রতিটি রাষ্ট্রীয় ভাঙ্গাগড়ার কালে বিরাট সংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটে, অনেক সম্পদ নষ্ট হয়। ইংরেজ চলে যাওয়ার পরে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের একাংশের মুখে আমরা শুনেছি যে, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উপমহাদেশে এক কোটি লোক নিহত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহতদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর দেশের রাজনৈতিক নেতাদের একাংশের মুখে আমরা শুনছি যে, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ লোক শহীদ হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি যাই হোক, মানুষ টিকে ছিল, টিকে আছে। কিন্তু এখন যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমরা সভ্যজগতে কতকাল টিকতে পারব? যারা আমাদেরকে ঋণ-রিলিফ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে তারা কতকাল আমাদেরকে সভ্যজগতে থাকতে দেবে? চলমান প্রক্রিয়ায় আমরা কি অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কিংবা আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের নিয়তির মতোই একটা নিয়তির অধিকারী হতে চলছি না? সরকারী মহলের লোকেরা আমাদের প্রশ্নের কি জবাব দেবেন?

আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা বলে চলছেন যে, সরকারের সদিচ্ছার অভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস বন্ধ হচ্ছে না। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে তিন দিনের মধ্যেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসমুক্ত হতে পারে।

কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়ায় সরকারী দলের ছাত্রকর্মীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্লোগান তুলেছে : 'বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস কেন?- শেখ হাসিনা জবাব চাই', 'শেখ হাসিনার শেখ হাসিনার- রক্ত চাই রক্ত চাই' এবং দেশের প্রায় সব দৈনিক পত্রিকায় এসবের খবর প্রকাশিত হয়েছে। তখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছিল। শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের এক অধিবেশনে উত্তেজিত বক্তৃতার মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, 'সরকারী দলের ছাত্ররা আমার রক্ত চেয়েছে। আমার রক্ত দিয়ে যদি সন্ত্রাস বন্ধ হয় আমি রক্ত দিতে প্রস্তুত আছি। আজ থেকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সমস্ত কর্মকান্ড বন্ধ রাখলাম। দেখি সন্ত্রাস বন্ধ হয় কি-না।' জাতীয় সংসদে শেখ হাসিনার ওই বক্তৃতার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি, এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও সন্ত্রাস একদিনের জন্যও থামেনি। অস্ত্রের ঝনঝনানি অব্যাহত আছে। আওয়ামী লীগ মহল থেকে সন্ত্রাসের জন্য একতরফাভাবে সরকারকে দায়ী করা হচ্ছে। সন্ত্রাস দমনের উপায় উদ্ভাবনের ও কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য ১৫ সদস্যের যে সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল, গুজব শোনা যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যগণ সেই কমিটি থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নেবেন। কিন্তু তাতে কী ফল হবে? দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং দেশে বিরাজমান সন্ত্রাস সম্পর্কে আওয়ামী লীগের মোট বক্তব্য কি? সরকারের উদ্দেশে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কেই বা আওয়ামী লীগ কী বলবে? আজ সরকার যদি খালেদা জিয়ার স্থলে শেখ হাসিনার নেত্রীত্বে গঠিত হত, তাহলে আওয়ামী লীগের লোকেরা কিভাবে দেশের সমস্যাবলী মোকাবিলা করতেন?

শেখ হাসিনা সম্প্রতি ঢাকায় অবস্থানকারী বিদেশী দূতাবাসের প্রধানদের কাছে এবং ঋণদাতা-রিলিফদাতা বিদেশী অর্থসংস্থার প্রধানদের কাছে এক পত্র লিখে জানিয়েছেন যে, আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীরা দেশব্যাপী সরকারী দলের সন্ত্রাসের শিকার। তারা নির্যাতিত হচ্ছে। সরকার কোনো প্রতিকার করছে না। ফলে গণতন্ত্রের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। পত্রে তিনি জানিয়েছেন যে, আওয়ামী লীগ বর্তমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে আসছে; কিন্তু সরকারের সদিচ্ছা না থাকার ফলে সবই ব্যর্থ হতে চলেছে। পত্রে তিনি গণতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে কূটনীতিক ও ঋণ-রিলিফদাতাদেরকে ব্যর্থহীন ভাষায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অবহিত করে দিয়েছেন। শেখ হাসিনার এই চিঠি লেখার ব্যাপারটি আওয়ামী লীগ মহল ছাড়া অন্য সকল মহল থেকেই দারুণভাবে ধিকৃত হয়ে চলছে। আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে অবশ্য শেখ হাসিনার ভূমিকাকে এই বলে সমর্থন দিয়ে চলছে যে, লাগাতার আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে ১৯৮৮ সালের শুরুতে বিএনপি নেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী কূটনীতিকদের ও ঋণ-রিলিফদাতাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সজাগ করে দেয়ার জন্য ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন। সুতরাং বিদেশী কূটনীতিকদের ও ঋণ-রিলিফদাতাদের কাছে শেখ হাসিনার চিঠি লেখা মোটেই কোনো আকস্মিক নতুন ব্যাপার নয়- বাংলাদেশের চলমান রাজনীতির ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেই তিনি এই চিঠি লিখেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সেদিন শুধু বি চৌধুরী ওয়াশিংটন যাননি, আওয়ামী লীগ নেতা কামাল হোসেন, এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত প্রাক্তন মন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত প্রমুখও একই উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন। তাঁদের ওই ওয়াশিংটন যাত্রার ঘটনাটিকে দেশের মানুষ কিন্তু সেদিন মোটেই ভালো দৃষ্টিতে দেখেনি। তাঁদের ওই কাজ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলে সেদিন নিন্দিত হয়েছিল। আজ সেই ধারায় কাজ করতে গিয়ে শেখ হাসিনা নিন্দিত হচ্ছেন। সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুস সামাদ আজাদ উপজেলা চেয়ারম্যানদের সভায় শেখ হাসিনার চিঠি লেখার ব্যাপারটির পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে বলেছেন যে, শেখ হাসিনা মাত্র একটি চিঠি লিখেছেন তাতেই এত বিচলন, তিনি আরও চিঠি লিখবেন, একটির পর একটি চিঠি লিখে চলবেন, দেখি কে কি করতে পারে? আমাদের প্রশ্ন হল, সন্ত্রাস দমনের ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বিদেশী শক্তির কাছে গিয়ে আওয়ামী লীগ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা দ্বারা জনগণের জন্য আওয়ামী লীগ কী অর্জন করতে চায়? জাতির আত্মনির্ভরতার প্রশ্নটিকে আওয়ামী লীগের লোকেরা কি তাৎপর্যহীন মনে করেন?

কয়েক মাস আগে সংবাদপত্রে দেখা গেছে, বিএনপি'র ছাত্রদলের পরিত্যক্ত সশস্ত্র একটি গ্রুপকে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনার মাধ্যমে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি তাদের গ্রহণ করে নিয়েছেন? তিনি কি আশা করেছেন যে, দুষ্কৃতকারীদের ও সন্ত্রাসীদের দলে টেনে এনে তিনি তাদের পুনর্বাসন ও সংশোধন করবেন? না কি তিনি অন্য কিছু ভেবেছেন। এই ঘটনার পরে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে লোকের ধারণা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতারা আসলে কি ভাবছেন তা কি তাঁরা অকপটে দেশবাসীকে জানাতে পারেন না? জেনারেল জিয়ার শাসনকাল থেকেই বিএনপি'র ছাত্রদলের অভ্যন্তরে একটি প্রবল সশস্ত্র গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল। অনেকে মনে করেন, তারই ফলে বিএনপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং তারই ফলে খালেদা জিয়া আজ প্রধানমন্ত্রী- বিএনপি ক্ষমতাসীন। শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের নেতারা